মুফতি হান্নান ও বাংলাভাইদের

গডফাদারের সন্ধানে

সাজেদুর রহমান

বাংলাদেশে মৌলবাদী জঙ্গীগোষ্ঠীর কর্মকান্ড যে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে তা নিয়ে কোনো রকম বিতর্ক থাকার অবকাশ নেই। অন্তত ১৭ আগস্টে ৬৩ জেলায় প্রায় একযোগে বোমা বিস্ফোরণের পর। অথচ এসব জঙ্গীগোষ্ঠীর উত্থান ঘটেছে বছরের পর বছর ধরে এবং সরকার-প্রশাসনের ছত্রছায়ায়। বিভিন্ন জঙ্গীগোষ্ঠীর নেতারা বিভিন্ন এলাকায় কায়েম করেছে নিজস্ব রাজত্ব। প্রশাসন ও পুলিশের প্রশ্রয়ে এরা চালিয়ে যাচ্ছে নৈরাজ্য। বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলে এক বাংলা ভাই'র কার্যক্রমই প্রমাণ করেছে এরা কতোখানি শক্তিধর। একই সঙ্গে প্রশ্ন উঠেছে, কার বা কাদের মদদে এরা শক্তি সঞ্চয় করেছে? এরা কী একটি রাষ্ট্রের নির্বাচিত সরকারের চেয়েও বেশি শক্তিধর? সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা গেছে, ক্ষমতাসীন জোট সরকারের একাধিক মন্ত্রী-সাংসদদের সঙ্গে বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পৃক্ততার কথা। দীর্ঘদিন ধরে যে ধারণা করা হচ্ছিল, সরকারের ভেতরই জঙ্গিগোষ্ঠীর মদদদাতারা সক্রিয় রয়েছে, এখন যেন তা সত্যি প্রমাণিত হতে চলেছে। একাধিক গডফাদারের ছত্র-ছায়াতেই বেড়ে উঠেছে বাংলা ভাই, মুফতী হান্নান, মাওলানা মাসউদসহ বিভিন্ন জঙ্গি নেতা। এসব গডফাদাররা সরকারকে তো বটেই, গোটা দেশকেই ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

বাংলা ভাই'র গডফাদার কে বা কারা?

রাজশাহী ও নাটোর জেলাসহ বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল দীর্ঘদিন ধরে তথাকথিত সমাজতন্ত্রের লেবাসধারী সর্বহারা বাহিনীর অভয়ারণ্য ছিল। তাদের অত্যাচার-নির্যাতন, খুন-জখমে এখানকার বিশেষত গ্রামাঞ্চলের মানুষের জীবনযাপন ছিল দুঃসহ। সর্বহারাদের বিরুদ্ধে জনগণের এই আক্রোশকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতাসীন চারদলীয় জোট সরকারের মদদে গড়ে তোলা হয় পাল্টা এক সন্ত্রাসী বাহিনী। নাম দেয় জাগ্রত মুসলিম জনতা যারা মূলত একটি জঙ্গিগোষ্ঠী। সিদ্দিকুর রহমান ওরফে বাংলা ভাই নামে এক ধর্মান্ধ সন্ত্রাসীর নেতৃত্বে বছরের পর বছর ধরে এই অঞ্চলে এই জঙ্গিগোষ্ঠী চালিয়ে যাচ্ছে নৈরাজ্য ও নির্যাতন। চারদলীয় জোট সরকারের একাধিক নেতা যে বাংলা ভাইকে মদদ দিয়ে এসেছে তা দিনকে দিন স্পষ্ট হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন সে কারণেই সংবাদমাধ্যমে বারবার বাংলা ভাই'র কার্যক্রম তুলে ধরা হলেও সরকার বরাবরই তা অস্বীকার করেছে। এমনকি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের পরও বাংলা ভাইকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি। কিন্তু, ১৭ আগস্টে বোমা হামলার পর সরকারই সিদ্দিকুর রহমান ওরফে বাংলা ভাইকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য পত্রিকায় ছবিসহ বিজ্ঞাপন দিয়েছে। অথচ অভিযোগ রয়েছে, জোট সরকারের এক প্রভাবশালী উপমন্ত্রী প্রত্যক্ষভাবে বাংলা ভাইকে মদদ দিয়ে আসছেন। হালে পরিস্থিতি প্রতিকূলে চলে যাওয়ায় এই উপমন্ত্রী এখন যোগাযোগ কমিয়ে দিয়েছেন।

ভূমি উপমন্ত্রী রুহুল কুদ্দুস দুলুর ভাতিজা ছাব্বির হোসেন গামাকে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ সালে নাটোরের চরমপন্থিরা খুন করে। গামা নিজেও অবশ্য এক সন্ত্রাসী বাহিনীর নেতৃত্ব দিত। অভিযোগ রয়েছে, এ খুনের প্রেক্ষিতে উপমন্ত্রীর মদদে মুসলিম জনতা পার্টি নামের এক জঙ্গিবাহিনী গঠন করা হয়। বাংলা ভাইকে করা হয় এর অপারেশন কমান্ডার। পরবর্তীতে সংগঠনের নামটিও পরিবর্তন হয়ে যায়। নাম হয় জাগ্রত মুসলিম জনতা। এই বাহিনী জামায়েতুল মুজাহেদীন বাংলাদেশ (জেএমবি) নামে কুখ্যাত জঙ্গীগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। জেএমবির প্রধান মাওলানা আবদুর রহমানও ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। জাগ্রত মুসলিম জনতা পার্টির জন্ম নাটোর শহরে হলেও এর মূল কার্যক্রম চলতো রাজশাহীর বাগমারা, গাইবান্ধা, বগুড়া, জয়পুরহাটসহ উত্তরাঞ্চলের বেশ কয়েকটি এলাকায়।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, বাংলা ভাই নাটোরে অন্তত দু'বার প্রকাশ্যে উপমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রথমবার গামার মৃত্যুর এক

মাস পর। আরেকবার গত পৌর নির্বাচনের ঠিক দু'দিন আগে। দু'বারই বাংলা ভাই মাইক্রো ও মোটরসাইকেলযোগে দলবল নিয়ে প্রকাশ্যেই উপমন্ত্রীর বাড়িতে আসে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। এর বাইরে বেশ কয়েকবার গোপনে উপমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক উপমন্ত্রীর একজন প্রতিবেশী জানান, ২০০৪ সালের এপ্রিলে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গ্রেপ্তারের নির্দেশের পরও দুলুর সঙ্গে নাটোরে এসে বাংলা ভাই দেখা করে গেছে। জানা যায়, ৪ মে, ২০০৪ রাত ১০টার দিকে বাংলা ভাই ও তার দলবল ঢাকা মেট্রো-এ-০৪-০৫৮৪ নম্বরের একটি প্রাইভেটকারে চড়ে এসেছিল। অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা যায়, প্রাইভেটকারটি ব্যবহার করে নাটোরের শীর্ষ সন্ত্রাসী এবং নাটোর পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কমিশনার ডাম্বেল। সে এই প্রতিনিধিকে দম্ভের সঙ্গেই বলে, 'বাংলা ভাই কে? আমরাই তো বাংলা ভাই।' উপমন্ত্রীর সঙ্গে বাংলা ভাইয়ের যোগাযোগ প্রসঙ্গে ডাম্বেল জানায়, 'তিনি (মন্ত্রী) একজন জনপ্রতিনিধি। তার কাছে কতো লোকই তো আসে। বাংলা ভাইও আসতে পারে।'

গোয়েন্দা সংস্থা সূত্রেও জানা গেছে যে ২০০৪ সালের মে মাসে বাংলা ভাই ওরফে সিদ্দিকুর রহমান এসে উপমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল। বাংলা ভাইর সহচররা নিয়মিত উপমন্ত্রীর সহচরদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে, অনেক অপারেশনে তারা যৌথভাবেও কাজ করেছে।

জেএমবি নেতা বাংলা ভাই ও তার লোকজনের সঙ্গে উপমন্ত্রীর যোগাযোগের বিষয়ে সাক্ষ্য দেন স্থানীয় রিকশাচালক, ব্যবসায়ী, মসজিদের ইমাম, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, শিক্ষক, আইনজীবী, সাংবাদিকসহ এলাকার সর্বস্তরের মানুষ। প্রত্যেকেই বলেন যে উপমন্ত্রী প্রকাশ্য সভা করে এই বাংলা ভাইয়ের সমর্থন করেছেন। তবে যারাই কথা বলেছেন তাদের প্রায় প্রত্যেকেই নাম-পরিচয় প্রকাশ না করতে অনুরোধ করেছেন। একজন বললেন, 'ভাই ওরা সব পারে। দিনে-দুপুরে মানুষ খুন করে। পুলিশকে মারে।'

নাটোরের অ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম সাপ্তাহিক ২০০০-কে জানান, 'পৌর নির্বাচনের দু'দিন আগে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বাংলা ভাই ও তার দলের লোক নাটোরে মন্ত্রীর বাসায় আসে। আর যায় দুপুর ১২টার দিকে।'

এছাড়া মন্ত্রীর বাড়ি নলডাঙ্গায়ও বাংলা ভাইয়ের সঙ্গে বৈঠক হয়। প্রথম দিকে দিনে-রাতে সব সময় বৈঠক করলেও পরবর্তীতে তারা গোপনেই দেখা করতো বলে তিনি জানান।

নাটোর জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি অ্যাডভোকেট সাজেদুর রহমান ২০০০-কে বলেন, 'এই শহরের বাসিন্দাদের কানে শোনার

গোলাম আজমের আসা-যাওয়ার ব্যাপারে দস্তানাবাদ দাখিল মাদ্রাসার পাশে বসবাসরত লুৎফর রহমান প্রশ্ন করেন, 'আচ্ছা, গোলাম আজম রাজনীতি থেকে অবসর নিয়েছেন, না আন্ডারগ্রাউন্ডে গেছেন?' আরো অনেকেই একই প্রশ্ন তুলেছেন

এবং চোখ দিয়ে দেখার ক্ষমতা যদি থাকে, তবে তারা সবাই দেখেছে এবং শুনেছে- নাটোরের মন্ত্রী রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু সন্ত্রাসের বিকল্প হিসেবে সন্ত্রাস করেছেন। বাংলা ভাইকে সৃষ্টি করেছেন।'

তবে গত ২৭ সেপ্টেম্বর ভূমি উপমন্ত্রী রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু এক জনসভায় চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, 'কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে আমার এলাকায় বাংলা ভাই'র কোনো কর্মকান্ড ছিল তবে আমি রাজনীতি থেকে পদত্যাগ করবো।'

অব্যাহত আছে জঙ্গি তৎপরতা

গত ২৪ সেপ্টেম্বর নাটোর জেলা প্রশাসনের দপ্তরে একটি ফ্যাক্স বার্তা আসে। একজন মন্ত্রী, এক প্রতিমন্ত্রী এবং একজন উপমন্ত্রীর স্বাক্ষর সংবলিত সে ফ্যাক্স বার্তায় বলা হয়, জেএমবি সদস্য ও জঙ্গি ধরতে কোনো মুসল্লিকে হয়রানি করা যাবে না। [*এই তিন মন্ত্রী হলেন রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু, ব্যারিস্টার আমিনুল হক ও ফজলুর রহমান পটল।*] স্বভাবতই এর ফলে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের অবস্থান আর ততোটা কঠোর হয়নি। ফলে, জেলা সদরে জেএমবির প্রকাশ্য তৎপরতা না থাকলেও নলডাঙ্গা, সিংড়া, দস্তানাবাদ, লালমোহনসহ জেলার বেশ কয়েকটি এলাকায় এদের তৎপরতা অব্যাহত আছে।

একজন জঙ্গি নেতা সামাদ

নাটোরের মাদ্রাসা মোড় থেকে বাসে ৩০ মিনিটের পথ সিংড়া বাসস্ট্যান্ড। সেখান থেকে রিকশায় জামতলি বাজার হয়ে দুই নম্বর ইউনিয়ন, নাম ইটালি। এখানে রোডের পাশেই সুকুর আলীর চায়ের দোকান। দোকানে বসে কথা বলছিলেন আরজু ভুঁইয়া, কালু শেখ ও লিয়াকত আলী। প্রত্যেকের বয়স ৪০ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে। তাদের কাছে জেএমবি সম্পর্কে জানতে চাইলে বললেন, এ এলাকায় অনেক জেএমবি সদস্য আছে যারা নিজেরাই বলে, 'আমরা জাগ্রত মুসলিম জনতার সদস্য। বাংলা ভাই আমাদের নেতা।' তবে তারা আত্মস্বীকৃত ওই জেএমবি সদস্যদের পরিচয় জানাতে অস্বীকার করেন। একজন বলেন, 'আমাদের কেন বিপদে ফেলবেন? আপনি তো চলে যাবেন, আমরা থাকবো। পুলিশ তো ওদের ধরে নিয়ে গেলে আমাদের বাঁচতে দেবে না।'

শহর থেকে শুনে এসেছিলাম, আবদুস সামাদ নামে জনৈক ব্যক্তি কৃষি, ইসলামী ও সোনালী ব্যাংকের নাটোর শাখা থেকে ১৭ আগস্টের আগে বিভিন্ন মেয়াদে ২৭ লাখ ৬৬ হাজার টাকা উত্তোলন করেছে। সেই সামাদের বাড়িও ইটালি ইউনিয়নে। সামাদ ব্যাংকগুলোতে এই ঠিকানা দিলেও ওই নামে সেখানে কাউকে পাওয়া যায়নি। স্থানীয়রাও কেউ কোনো তথ্য জানাতে পারল না। এমন সময় স্থানীয় দৈনিক উত্তরবঙ্গ বার্তার সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার নবির উদ্দিন মোবাইলে জানালেন, ইটালি ইউনিয়নের সিকিরচরে আঃ সামাদের বাড়ি।

ইউনিয়ন সদর থেকে ১৫ কিলোমিটার উত্তরে সিকিরচর। দিনের আলো প্রায় শেষ হয়ে আসছে। গ্রামের আঁকাবাঁকা মাটির পথ। পথের কোনো কোনো জায়গায় গত রাতে হয়ে যাওয়া বৃষ্টিতে কাদা জমেছে। ফলে, অনেক জায়গায় চালকের সঙ্গে ঠেলে ভ্যান সামনে নিতে হয়েছে। সিকিরচর গ্রামের সামাদের বাড়ি যখন পৌঁছালাম তখন রাত। বাড়িতে ঢুকতেই ৫-৬ বছরের একটা ছেলে এসে বলল, 'আপনি কারে খুঁজিচ্ছেন?'

বললাম, 'আবদুস সামাদ সাহেব আছেন?' বালকটি খানিকক্ষণ চুপ থেকে কিছু না বলেই পেছন ঘুরে দিলো দৌড়। একটু পরে একজন মধ্যবয়স্ক মহিলা একটি কুপি হাতে এসে বললেন, 'ভাই আপনি কুট থাইক্যা আইছেন?

'আমি রংপুর থেকে এসেছি। আবদুস সালাম আমার পূর্বপরিচিত।'

মহিলাটি আমাকে যথাসম্ভব কুপির আলোয় পর্যবেক্ষণ করে বাড়ির ভেতরে ঢুকতে বললেন। মাটির দেয়াল, টিনের ছাউনির দোচালা তিন-চারটি ঘর নিয়ে এই বাড়ি। দু'টি

মুফতি হান্নান কাহিনী

জঙ্গি নেতা মুফতি হান্নান গ্রেপ্তার হয়েছে। সংবাদটি চাঞ্চল্যকর। তার চাইতে চাঞ্চল্যকর সংবাদ হলো মুফি হান্নানের সঙ্গে সরকারের মন্ত্রীদের যোগাযোগের। মুফতি হান্নান ২০০০ সালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার চেষ্টা করেছিল। সে গোপালগঞ্জে ৭৬ কেজি বিশাল বোমা পুঁতে রেখেছিল যা গোয়েন্দা তৎপরতায় ফাঁস হয়ে যায়। আলোচিত মুফতি হান্নানকে গত পহেলা অক্টোবর রাজধানীর মধ্যবাড্ডা থেকে র‍্যাব গ্রেপ্তার করেছে। গ্রেপ্তারের সময় এই জঙ্গি নেতার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ বোমা তৈরির সরঞ্জাম, নগদ দুই লাখ টাকা উদ্ধার করেছে র‍্যাব। ওই দিনই সন্ধ্যায় মুফতি হান্নানকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি করলে বেরিয়ে আসে তার প্রশ্রয়দাতা গডফাদারদের নাম ও ক্ষমতার উৎসের কথা।

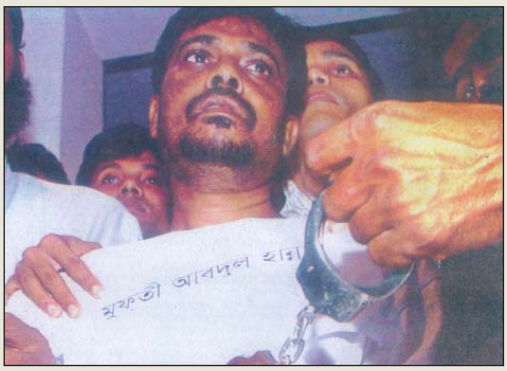

মুফতি হান্নান

এতোদিন বিরোধী দলের পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছিল জঙ্গিদের পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে সরকার কিংবা সরকারের শরিক দল জামায়াত ও ইসলামী ঐক্যজোট। সরকার এই মন্তব্যকে পাশ কাটিয়ে নিজের মতো অন্যদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে আসছিল। মুফতি হান্নান সরকারের সে মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছে। মুফতি হান্নান বলেছে, শেখ হাসিনাকে বোমা হামলার দায় থেকে মুক্তির জন্য সরকার তাকে আশ্বাস দিয়েছিল। সে সময়কার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) আলতাফ হোসেন মুফতি হান্নানকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তাকে সকল দায় থেকে মুক্ত করে দেবে। শেষমেশ বিষয়টি সফল হয়নি।

সরকারের সঙ্গে সমঝোতা : গত শনিবার মুফতি হান্নান সাংবাদিকদের জানান, গোপালগঞ্জ মামলার পর থেকে সে দেশেই ছিলো। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর সে জোট সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে। ইসলামী ঐক্যজোট নেতা মাসিক মদিনা সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীনের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। হান্নান মন্ত্রীকে নানা ঘটনার কথা খুলে বলে এবং শান্তিমূলক ব্যবস্থা থেকে পরিত্রাণ চায়। মন্ত্রী তখন তাকে একটি 'মারসি পিটিশন' দাখিলের পরামর্শ দেন। সে অনুযায়ী মুফতি হান্নান পিটিশন দাখিল করে। মন্ত্রী তাকে ঢাকায় আত্মগোপনের পরামর্শ দেয়। উপস্থিত সাংবাদিকদের সে এও বলেছিল, জোট সরকারের সঙ্গে সমঝোতা করেই দেশে ছিল। মুফতি হান্নানের সঙ্গে মন্ত্রী আলতাফ হোসেনের যোগাযোগ অন্যভাবেও ছিলো। জানা যায়, আলতাফ হোসেনের ভাতিজা পরিচয় দানকারী শাকিল হান্নানের সেকেন্ড ইন কমান্ড শাকিল অবশ্য আত্মগোপনে আছে।

বাংলা ভাই, শায়খ আবদুর রহমান কানেকশন : জামাআতুল মুজাহেদিনের শায়খ আবদুর রহমান, মুফতি হান্নান, মুফতি আবদুল হাই, শফিকুর রহমান এরা সবাই একসঙ্গেই আফগানিস্তানে ছিলো। সেখান থেকে ফিরে মুফতি হান্নান, মাওলানা আবদুর রহমানসহ ৫ সদস্যের একটি টিম দেশে ইসলামী বিপ্লবের স্বপ্নে জঙ্গি গ্রুপ তৈরি করতে থাকে। তারই ফলশ্রুতিতে মুফতি হান্নানের নেতৃত্বে হরকাতুল জিহাদ, শায়খ আবদুর রহমানের নেতৃত্বে জামাআতুল মুজাহেদিন, সিদ্দিকুল আলম বাংলা ভাইয়ের নেতৃত্বে জাগ্রত মুসলিম জনতা এবং ড. আসাদুল্লাহ আল গালিবের নেতৃত্বে আহলে হাদিস আন্দোলন জঙ্গি প্রশিক্ষণ ও সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি গ্রহণ করে চূড়ান্তভাবে।

বিস্ময়টা এখানেই যে একজন চিহ্নিত উগ্র জঙ্গি সরকারের মন্ত্রীসহ বিভিন্ন স্তরের নেতাদের নিয়মিত যোগাযোগ রাখতো। আর এ প্রেক্ষিতে বলা যায় জোট সরকারের প্রশ্রয় ও আশ্রয়ে জঙ্গিরা আজ এতো বেপরোয়া। সারা দেশে তারা সিরিজ বোমা হামলার মতো বড় অপরাধ সংঘটিত করছে।

চার দলীয় জোট সরকারের অন্যতম শরিক জামায়াত ও ইসলামী ঐক্য জোটের কর্মীরা যে এসব জঙ্গিদের অন্যতম সদস্য তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। মুফতি হান্নানের পালিয়ে থাকার সময়কার কথা বিবেচনায় আনলে পরিষ্কার হয় যে মাসিক মদিনা ও জোটের মদদপুষ্ট ইসলামী ঐক্যজোট জঙ্গিদের নিরাপদ আশ্রয় স্থল।

এ রকম এক প্রেক্ষাপটে বলতে হয়, সরষেতে ভূত থাকলে ভূত ছাড়ানো রীতিমতো মুশকিল। আর তাই জামায়াত ও ঐক্যজোটকে সঙ্গে নিয়ে সরকারের পক্ষে জঙ্গি দমনও অসম্ভব।

ঘর থেকে মৃদু আলোর রেখা বের হচ্ছে। মহিলা আমাকে একটি ঘরের বারান্দায় নিয়ে কাঠের টুল এগিয়ে দিয়ে ঘরের মধ্যে চলে গেলেন। একটু পরে মধ্যবয়স্ক একজন পুরুষ বেরিয়ে এলেন। খুব লম্বা নয় আবার খাটোর দলেও ফেলা যায় না লোকটিকে। মুখের দাড়ি বেশ মাপমতো কাটা। মাথায় টুপি, পরনে লুঙ্গি-পাঞ্জাবি। লোকটিকে দেখেই উঠে একটা লম্বা সালাম দিয়ে বললাম, 'ভাই আমি আপনাদের বিশ্বস্ত একজন।' লোকটা কি বুঝে আমাকে ভেতরে নিয়ে গেলেন। ঘরে ঢুকে একটু ভড়কে গেলাম। বিভিন্ন বয়সের আরো ছয়জন লোক বসে আছে। প্রত্যেকের চোখে-মুখেই উদ্বেগের সুস্পষ্ট চিহ্ন। উদভ্রান্ত দৃষ্টিগুলোকে যতোটা পারা যায় অগ্রাহ্য করে হাসার চেষ্টা করলাম। তবে তারা প্রায় একযোগে সালাম দিলো। সালামের উত্তর দিয়ে তাদের পাশে বসতে বসতে নিজের সম্পর্কে বললাম, 'আমি রংপুর থেকে এসেছি। যাবো ঢাকায়। সংবাদপত্রে কাজ করি। আপনাদের পক্ষে লিখতে চাই।'

আবদুস সামাদ নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আমি জেএমবির আঞ্চলিক কমান্ডার। আর ঘরের মধ্যে যারা আছে তারা জেএমবির সদস্য।' সদস্যদের নাম জানতে চাইলে সামাদ জানান, লাবলু (১৭), আকাশ (২২), আউয়াল (২৫), ফারুক (৩৭), শহিদুল (৩৫) ও রবিউল (৩৫)।

জঙ্গিদের সঙ্গে যেসব কথোপকথন হলো তা অনেকটা এ রকম-

২০০০ : আবদুস সামাদ, আপনি কমান্ডার, তাহলে ১৭ আগস্ট তো আপনার ভূমিকা ব্যাপক ছিলো।

আঃ সামাদ : ভূমিকা আর কী, টার্গেট ছিলো ১০টা স্পটে ফুটানো, ফুটাইছি ৭টা স্পটে।

২০০০ : বাকি জায়গায় পারেননি ক্যান?

সামাদ : যাদের করার কথা আছিল তারা আসে নাই।

২০০০ : খরচ কতো হইছিল?

সামাদ : আমি ৫০ লাখ ট্যাকা আনছিলাম।

২০০০ : সব ট্যাকাই কি নাটোরে খরচ করেন?

সামাদ : না, কি কন, পাবনা, বগুড়া, সিরাজগঞ্জে পাঠালাম না।

২০০০ : এতো ট্যাকা কি কামে খরচ হলো?

সামাদ : কর্মীদের থাকা খাওয়া। সদস্যরা নিজেরা তো কোনো কাম করে না। তাদের থাকা-খাওয়ার খরচ। তা ছাড়া কর্মীদের পরিবারদেরও খরচ বহন করা লাগিচ্ছে।

১৭ আগস্টের পর অবশ্য জেএমবি সদস্যরা খানিকটা বেকায়দায় আছে। এদের অনেকেই নাটোর শহর ছেড়ে পালিয়েছে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে। ৬ জঙ্গির মধ্যে সবচেয়ে তরুণ সদস্য লাবলু বলে, 'এতোদিন শহরেই থাকিচ্ছিনু। কয়েকদিন আগে সেটিও পুলিশ আসে। ৪ জনকে ধরে নিয়ে গেছে। হামরা দৌড়ে চলে আচ্ছি।'

'তোমরা কয়জন ছিলে?'

'হামরা ১৮ জন ছিলাম।'

'বাকি সব কয় গেছে?'

এ প্রশ্নের উত্তর লাবলু দেয় না। বরং জঙ্গিরা পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকায়। মনে হচ্ছে আমার এ প্রশ্নে তারা সন্দেহ করছে। বিষয়টি জটিল হয়ে যাওয়ার আগেই বললাম, বাকিদের বিপদ হয়নি তো। জঙ্গি সদস্য রবিউল বলল, 'সমস্যা কি, ওরাও ভালো আছে।'

সামাদ আরো জানালো, ওই দিনের ১৮ জনের মধ্যে কয়েকজন মেয়ে সদস্যও ছিলো। তাদের দু'জন চৌগ্রামে আছে। জঙ্গিদের তথ্য মতে চৌগ্রাম ইউনিয়নের সদরে কলেজ শিক্ষক মজিবুর রহমানের বাড়িতে দু'জন মহিলা জঙ্গি অবস্থান করছে।

এ রকম লুকিয়ে থেকে কর্মতৎপরতা চালানো যাচ্ছে কি না জানতে চাইলে আঃ সামাদ জানায় যে তারা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখছে। ১৭ আগস্ট এতো বড় কাজ করা হলো। বিষয়টা নিয়ে বেশ তোলপাড় হয়েছে। একটু থিতু হয়ে আসলে আবার প্রকাশ্যে কাজ করবে। 'এখনো যে আমরা বসে আছি তা না। এর মধ্যেও হামরা দাওতি কাম করিচ্ছি।'

২০০০ : নাটোরে জেএমবির অবস্থা কেমন। সব থানায় আপনাদের লোক আছে কি?

সামাদ : হামাগোর লোক সারা দেশেই আছে। এই জেলায় যে কি পরিমাণ আছে তা কল্পনা করবার পারবেন না।

২০০০ : বাংলা ভাইকে দেখছেন কখনো?

সামাদ : হ। বাংলা ভাইয়ের সঙ্গে অনেকদিন থাকিছি।

২০০০ : স্থানীয় বিএনপি-জামায়াতের নেতারা আপনাদের সাহায্য করিচ্ছে না।

সামাদ : বিএনপির কথা কবার পারমুনা। ওরা একবার এক কথা, আরেকবার আর এক কথা কয়। তবে জামায়াত আমাদের কোনোদিন কোনো ক্ষতি করেনি।

২০০০ : জামায়াতের কোনো নেতার সঙ্গে যোগাযোগ আছে?

সামাদ : ভাই আপনি এতো কথা শুনে কি লেখবেন, দেখেন ভাই ক্ষতি কইরেন না। হামরা আপনেক বিশ্বাস করিচ্ছি। আপনি আমাদের ক্ষতি করেন না।

এভাবে সামাদের মতো আরো অনেক উপনেতার নেতৃত্বে গোপনে চলছে জঙ্গিদের তৎপরতা। বাগাতিপাড়া থানার ৪নং দয়ারামপুরের কাদিরাবাদ কাজীপাড়া আহম্মদীয়া দাখিল ও আলিম মাদ্রাসায় জঙ্গিরা অবস্থান করছে। এছাড়াও সদর থানার লক্ষ্মীপুর ঘোলাবাড়িয়া দারুল উলুম সিনিয়র মাদ্রাসা, সদর উপজেলার ৯নং লক্ষ্মীপুরে জি.ই ফাজিল মাদ্রাসা, বাঘা উপজেলার জোত কাদিরপুর দাখিল মাদ্রাসা, চারঘাট উপজেলার বানুদিয়াড় দাখিল মাদ্রাসা, বড়াইগ্রাম থানার জোনাই বর্নি দাখিল মাদ্রাসাসহ ২০টির মতো মাদ্রাসায় জঙ্গি তৎপরতার খবর পাওয়া যায়।

বড়াইগ্রাম থানার জোনাই বর্নি দাখিল মাদ্রাসার ৭ম শ্রেণীর ইসমাইল হোসেন (১৩) জানায়, স্থানীয় জেএমবি নেতা আবদুস সালাম তাকে জেএমবিতে যোগ দিতে বলে। ইসমাইল সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে গত ২৯ আগস্ট জেএমবির সদস্যরা তাকে মারধর করে। ইসমাইল জঙ্গিদের হাতে নির্যাতনের শিকার হয়ে বড়াই গ্রাম স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ১৫ দিন চিকিৎসা নিয়ে ঘরে ফিরেছে। ইসমাইল শারীরিকভাবে সুস্থ হয়ে এলেও মাদ্রাসায় যাওয়া বাদ দিয়েছে। তার ভয় আবার যদি জঙ্গিরা

'এলাকার মানুষ ও পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলাম'

রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু
fig উপমন্ত্রী

সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনার এলাকাকে জঙ্গিদের অভয়ারণ্য বলা হয়...

দুলু : কথাটা ঠিক নয়। আমার এলাকা নাটোর-২। সেখানে জঙ্গিদের কোনো তৎপরতা নেই। যারা বলে তারা আমার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ। আর একটা কথা ১৭ আগস্ট সিরিজ বোমা হামলার পর জঙ্গি বিষয়ক তৎপরতা বহুগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি এলাকার সচেতন মানুষও উগ্রজঙ্গিবাদী বিষয়ে সচেতন আছে।

২০০০ : ১৭ আগস্ট ৪ জঙ্গি ধরা পড়ে। পালিয়ে গেছে আরো বেশি জঙ্গি, তারাও তো আপনার এলাকার।

দুলু : জঙ্গিদের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সচেতন থাকায় প্রশাসন ঘটনার ১২ ঘণ্টার মধ্যে জঙ্গি ধরতে সক্ষম হয়েছে। আমার এলাকায় যারা ধরা পড়েছে তাদের অনেকের বাড়ি নাটোরের বায়রে। একটা জিনিস বুঝতে হবে, গুটি কতক সমাজবিচ্ছিন্ন মানুষ ধর্মের নামে উগ্রতা প্রদর্শন করছে। তাদেরকে প্রতিহত করার দায়িত্ব যেমন সরকারের তেমনি বিরোধী দলেরও।

২০০০ : সর্বহারা দমনের নামে সিংরা নলডাঙ্গায় যে গণহারে ধ্বংসলীলা চলেছে তার সাক্ষাৎ এখনো এলাকায় গেলে দেখা যায়। আপনার এলাকায় এসব তান্ডবলীলা কারা করলো?

দুলু : একটা সময় নাটোরবাসী তথা উত্তরের সমস্ত জনপদ সর্বহারাদের তৎপরতায় অতিষ্ঠ ছিলো। তাই সর্বহারা দমনে সবাই যখন সোচ্চার হলো তখন কিছু চিহ্নিত সর্বহারাদের শায়েস্তা করা হয়েছে। সে সময় সর্বহারাদের যারা পৃষ্ঠপোষকতা করতো তারাও খানিকটা ইফেকটেড হয়েছিল। আসলে গণরোষে পড়ে গেলে যা হয়।

২০০০ : সে সময় বাংলা ভাই আপনার বাড়িতে আসে মিটিং হয় এবং একযোগে সর্বহারা দমনে...

দুলু : বিষয়টা এমন নয়। বাংলা ভাইয়ের সঙ্গে আমার কোনো সম্পৃক্ততা কখনোই ছিলো না। সর্বহারাদের হাতে নিজের ভাই ও ভাতিজা হত্যার পর আমার মানসিক অবস্থা বেশ বিপর্যস্ত ছিলো। সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে স্বীকৃত একটি পরিবারের ২ সদস্য যদি হারায় তবে মানসিক অবস্থা কেমন হতে পারে! সর্বহারারা আমাকে না পেয়ে আমার ভাই ও ভাতিজাকে হত্যা করেছে। পরিবারের ২ সদস্যকে হারিয়ে আমি স্বাভাবিকভাবেই মানসিক দুরবস্থার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করেছিলাম। সে সময় এলাকার মানুষ ও পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলাম। এলাকায় কিছু রাজনৈতিক নেতা ও সর্বহারাদের

সহযোগীরা রাজনৈতিক চাল হিসেবে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালিয়েছে। পুরো নাটোরে বাংলা ভাইর কোনো অস্তিত্ব কখনো ছিলো না।

২০০০ : বিটলী নামে একটি ছেলেকে ৮নং ওয়ার্ডের কমিশনার রুবেল দিনে দুপুরে খুন করলো। পুলিশ তাকে ধরলো না। সাধারণ মানুষ ঝাড়ু মিছিল করলো। তারপর আপনি নির্দেশ দিলেন রুবেলকে গ্রেপ্তার করার। রুবেল খুন করেও আপনার দল করায় কি পার পেয়ে যাবে?

দুলু : বিটলী নিজেও সন্ত্রাসী ছিলো। যতদূর জানি বিটলী মোবাইল চুরি সংক্রান্ত অভিযোগে কমিশনার তাকে ডেকে এনেছিলো। এরপর সাধারণ মানুষ গণপিটুনি দিয়ে তাকে মেরে ফেলে। তার পরও এলাকার মানুষ এসে বলেছে, আমি সুষ্ঠু তদন্তের নির্দেশ দিয়েছি।

২০০০ : দল থেকে তো বহিষ্কার করেননি।

দুলু : দলীয় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। তবে শিগগিরই নেয়া হবে। বিষয়টি এখনো তদন্তাধীন আছে। শেষ না হওয়া পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেয়া মুশকিল।

২০০০ : এবার ২১ ফেব্রুয়ারি পালনে বাধা এসেছে, আপনি কি বিষয়টি জানেন না?

দুলু : বিষয়টা আমার জানা নেই। তবে যতদূর জানি ঢাকা রোডের মসজিদ এলাকায় প্রভাতফেরিতে গান বন্ধ রাখা হয়েছিল। এতে কিন্তু ২১ ফেব্রুয়ারি পালন করতে দেয়া হয়নি বোঝায় না।

২০০০ : আপনার এলাকার কমিশনার ডাম্বেলকে নিয়ে অনেক অভিযোগ আছে।

দুলু : পাবলিক ফিগারদের ওপর পাবলিকের অভিযোগ আসাটাই স্বাভাবিক। তবে তার ব্যাপারে তেমন কোনো অভিযোগ আসেনি। আর যদি কোনো অভিযোগ থাকে তবে দেশে আইন আছে। যার অভিযোগ আছে সে আইনের আশ্রয় নিতে পারে।

২০০০ : ডাম্বেলের ভয়ে আইনের আশ্রয় নিতে পারে না বলেও অনেকে যুক্তি দেখান।

দুলু : এই বিষয়ে তো কিছু বলার নেই। আপনাকে বলছে ভয় যাচ্ছে না। বাস্তবে তো নাও হতে পারে। যারা অভিযোগ করে তলিয়ে দেখেন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের দৃষ্টিতেই করে।

২০০০ : লাঠি বাঁশি সমিতি এখন অকার্যকর। নাটোরে আবার চাঁদাবাজি সন্ত্রাস, ছিনতাই বেড়েছে।

দুলু : 'ডিকটেটরশিপ' আবদুস সালামের ক্ষেত্রে এটাই বলা যায়। সমিতিটাকে যদি গণতন্ত্রের চর্চা থাকতো তবে সমিতিটা আরো ইফেকটিভ হতো। তবে এখনো চলছে। এলাকায় সাব-কমিটিগুলো সক্রিয় আছে।

২০০০ : আপনার মন্ত্রণালয় সম্পর্কে কিছু বলুন...

দুলু : এক সময় দুর্নীতিতে ভূমি মন্ত্রণালয় প্রথম অবস্থানে ছিল। এখন এ অপবাদটা সেভাবে নেই। ভূমি সংক্রান্ত সমস্যা নিরসন ও এর পদ্ধতি সহজ করতে ভূমি ব্যবস্থাপনাকে কম্পিউটারের আওতায় আনা হচ্ছে। এ পদ্ধতিতে ভূমি সংক্রান্ত জটিলতা ও মানুষের হয়রানি দূর হবে। আর একটা বিষয়ে কাজ করছি। বর্তমানে ঢাকায় খাস জমির পরিমাণ ৬৪৯ একর। এর মধ্যে দখল হয়ে আছে ২০০ একর, পতিত আছে ৮ একর। এসব বিষয়ে মোট সাড়ে ১০ হাজার মামলা রয়েছে। দেশের ৮০ ভাগ সন্ত্রাস হয় জমিকে কেন্দ্র করে। সন্ত্রাসের উৎস হলো জমি। তাই ভূমি ব্যবস্থাপনাকে সুষ্ঠু ও সহজ করতে যুগোপযোগী আইন ও সমন্বয়ের প্রয়োজন।

তাকে নির্যাতন করে। পুলিশ সূত্রে জাগ্রত মুসলিম জনতা, বাংলাদেশ, জামায়াতুল মুজাহিদিন, শাহাদাৎই আলাহিকমা, আহলে হাদিস, যুব সংঘের ব্যানারে এখন জেলা জুড়ে ২ হাজার সশস্ত্র জঙ্গি আছে।

আন্ডারগ্রাউন্ডে গোলাম আজম ও জামায়াত

জামায়াতে ইসলামের সাবেক আমির গোলাম আজম সম্প্রতি নাটোরের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিভিন্ন মসজিদে বৈঠক করেছেন। গত ৩ ফেব্রুয়ারিও তাকে দেখা গেছে দস্তানাবাদ এলাকার কয়েকটি মসজিদে। এছাড়াও গত বছর ৩ বার ওই এলাকায় এসেছেন তিনি।

গোলাম আজমের এই আসা-যাওয়ার ব্যাপারটা স্থানীয়রা নিশ্চিত করে জানলেও জেলা গোয়েন্দা সংস্থা কিছুই জানে না বলে জানায়। নাটোর জেলার সোমা প্যাথলজির ডাক্তার জাকির তালুকদার জানান, তার অনেক রুগীই আসে দস্তানাবাদ থেকে। তাদের মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন গোলাম আজমের আসার খবর।

নাটোর শহর থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে দস্তানাবাদ বাজার। ওখানে খোঁজ নিয়ে জানা গেলো গোলাম আজম এলে দস্তানাবাদ দাখিল মাদ্রাসা ও মসজিদেই ওঠেন। ইলিয়াস হোসেন নামে এক ভদ্রলোক জানালেন, দস্তানাবাদে প্রায় হাজার দেড়েক আহলে হাদিসের লোক বাস করে। মুক্তিযুদ্ধের সময় এই এলাকায় প্রচুর রাজাকার, আলবদর, আল শামস ছিলো। শুধু দস্তানাবাদেই নয়, এর আশপাশের গ্রাম মহারাজপুর, শিকারপুর, শিকারপাড়া, হাসামারিতে রাজাকার ও আলবদরদের দৌরাত্ম্য ছিলো। ইলিয়াস আরো জানায়, 'স্বাধীনতার ৩৫ বছর পরেও এ এলাকাগুলোর অনেক মানুষ বিশ্বাস করেনি আমরা পাকিস্তান থেকে পৃথক হয়েছি।'

ইলিয়াস নিজেও আহলে হাদিসের লোক। সে জানায় মহারাজপুরে সবচেয়ে বেশি আহলে হাদিসের লোক আছে। এছাড়াও এখানে রাজাকার, আলবদর ছিলো সবচেয়ে বেশি। 'সেই যুদ্ধের আগে থেকেই গোলাম আজমসহ জামায়াতের বড় বড় নেতাদের আনাগোনা ছিলো, এখনো আছে।' ইলিয়াস গোলাম আজমকে প্রথম দেখে দস্তানাবাদ দাখিল মাদ্রাসায় ১৯৮৬ সালে। সে সময় গোলাম আজমের সঙ্গে পাবনার জামায়াত নেতা আব্দুস সোবহান এমপি ও মতিউর রহমান নিজামী ছিলো। দ্বিতীয়বার দেখে ১৯৯২ সালে। সে সময় রাজশাহীর জামায়াত নেতা অধ্যাপক মজিবুর রহমান, নওগাঁর মোজাফর হোসেন, নবাবগঞ্জের ওবায়দুর রহমান আসে গোলাম আজমের সঙ্গে। গোলাম আজমকে সে আরো দুবার দেখে ১৯৯৬ সালে জানুয়ারিতে ও ২০০৪-এর ডিসেম্বরে।

গোলাম আজমের আসা-যাওয়ার ব্যাপারে দস্তানাবাদ দাখিল মাদ্রাসার পাশে বসবাসরত লুৎফর রহমান প্রশ্ন করেন, 'আচ্ছা, গোলাম আজম রাজনীতি থেকে অবসর নিয়েছেন, না আন্ডারগ্রাউন্ডে গেছেন?' আরো অনেকেই একই প্রশ্ন তুলেছেন। লুৎফর রহমান জানান, গত ৩ ফেব্রুয়ারি গোলাম আজম সাহেব এসেছিলেন। এটাই ছিলো তাঁর শেষ আসা। তিনি মূলত দু'একজন সঙ্গি সঙ্গে নিয়ে খুব সাধারণভাবে আসেন। কোনোবার এসে দুদিন, তিনদিন এমনকি ৫ দিন পর্যন্ত থেকেছেন। তিনি চুপচাপ আসেন, বৈঠক করেন চলে যান। সাধারণ মানুষ কেউ কিছু জানতে বা বুঝতে পারতো না। কারণ দস্তানাবাদ মসজিদ সব সময়ই সুরক্ষিত রাখা হয়। সব সময় মসজিদের ভেতর সশস্ত্র ক্যাডাররা থাকতো। ক্যাডাররা সবার সঙ্গে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ে না।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, মহারাজপুর জামায়াতের আদি ঘাঁটি। হেড অফিস হিসেবে দস্তানাবাদ দাখিল মাদ্রাসাকে ব্যবহার করতো। আর সাব-অফিস ছিল মহারাজপুর দাখিল মাদ্রাসা। এখনো এই এলাকা জামায়াতের করায়ত্তেই আছে। এখানকার জামায়াত নেতা অধ্যাপক ইউনুস জামায়াতের জেলা আমির। তিনি ১৯৯১ সালে সংসদ নির্বাচনও করেছিলেন।

দস্তানাবাদ ও এর আশপাশের এলাকায় জামায়াত নেতারা শুধু বৈঠকই করতেন না। এখান থেকে তারা জঙ্গি রিক্রুট ও সশস্ত্র

ট্রেনিংসহ নানা ধরনের তৎপরতা চালিয়ে যান।

স্থানীয়রা জানান, মসজিদে নামাজ শেষে মুসল্লিরা বেরিয়ে এলেও জামায়াত নেতা-কর্মীরা বের হয় না। সাধারণ মুসল্লিরা চলে গেলে তারা গোল হয়ে বসে বৈঠক করে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন বাসিন্দা বলেন, 'আগে আমরা এগুলোতে আমল দিতাম না। ভাবতাম মসজিদে বসে আর কি করবে। কিন্তু এখন বুঝি ওরা মসজিদে বসে কি করে। অবশ্য ১৭ আগস্টের পর মসজিদে খুব একটা বৈঠক করতে দেখা যায় না।'

গ্রামের আরেক বাসিন্দা জানায়, 'এখানকার জঙ্গিদের তৎপরতার পেছনে জামায়াতের অবদান সবচেয়ে বেশি। এলাকার সহজ সরল ও হাবা গোবা সাইজের মানুষদের তারা টার্গেট করে। এদেরকে প্রথমে দিনের জিহাদি ছবক দেয়। যারা ছবকে রাজি হয়, তাদের শারীরিক ট্রেনিং দেয়। ট্রেনিং দেয় তারা স্থানীয় ঈদগাহের মাঠে। এ রকম ট্রেনিংরত অবস্থায় আমরা স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দিলে জেলার ওসি ফারুক ফোর্স নিয়ে এসে গত ১ ফেব্রুয়ারি ১১ জন জঙ্গিকে ধরে নিয়ে যায়। যাদেরকে ধরে নিয়ে গেলো তারা প্রত্যেকেই জামায়াতের কর্মী। অথচ পুলিশের কাছে বলেছে, তারা নাকি জেএমবি সদস্য।'

স্থানীয় ওই ব্যক্তির কথার সূত্র ধরে স্থানীয় থানায় খোঁজ নিয়ে জানা যায় ওই ১২ জনের ৪ জনকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। বাকি ৮ জন জেল হাজতে আছে। জঙ্গিরা তাদের সংগঠনের পরিচয় হিসেবে জেএমবি বা জামায়াত কোনোটাই বলেনি।

জামায়াতে ইসলামের এ তৎপরতা পুরো জেলা জুড়েই। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, জেলার কাপুড়িয়া, শিকারপুর, শিকার পাড়া, হাসমারি, নলডাঙ্গাসহ সর্বত্রই। নলডাঙ্গা কেন্দ্রীয় মসজিদের ইমাম জামায়াতের স্থানীয় আমির ডাক্তার ফজলুর রহমান। তিনি প্রায় রাতেই মসজিদের ভেতরে গভীর রাত পর্যন্ত বৈঠক করে। এই প্রতিনিধি গত ২৫ আগস্ট রাত ৯টার দিকে মসজিদে হাজির হলে দেখতে পায় মসজিদের ভেতর একটি মোম জ্বালিয়ে ১২-১৪ জন নিয়ে ফজলুর রহমান বৈঠক করছিল। আচমকা এ প্রতিবেদককে দেখে তারা দ্রুত কেটে পড়ে। এমনকি মসজিদের ইমাম ফজলুর রহমান তার নিজের পরিচয় গোপন করে।

নাটোর জেলার প্রাণকেন্দ্রে সুকুল পট্টি আহলে হাদিস জামে মসজিদ। এই মসজিদের ইমাম ও মাদ্রাসার প্রিন্সিপালের নামও গোলাম আজম। তিনি নাটোর জেলা আহলে হাদিস আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক। নাটোরে সাধুপাড়া মসজিদে ১২ জঙ্গি ধরা পড়লে হঠাৎ করেই গোলাম আজম উধাও হন। দু'মাস পর আবার স্বস্থানে ফিরে আসেন। স্থানীয় সূত্র মতে, নাটোরে ধরা পড়া জঙ্গিরা জানিয়েছে তাদের নেতা খাব্বাদ হোসেন যা কি না গোলাম

জেএমবি নেতা বাংলা ভাই ও তার লোকজনের সঙ্গে উপমন্ত্রীর যোগাযোগের বিষয়ে সাক্ষ্য দেন স্থানীয় রিকশাচালক, ব্যবসায়ী, মসজিদের ইমাম, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, শিক্ষক, আইনজীবী, সাংবাদিকসহ এলাকার সর্বস্তরের মানুষ। প্রত্যেকেই বলেন যে উপমন্ত্রী প্রকাশ্য সভা করে এই বাংলা ভাইয়ের সমর্থন করেছেন

আজমের ছদ্ম নাম। সে ড. গালিবের একজন ঘনিষ্ঠ সহচর। সেই গোলাম আজমের সঙ্গে কথা হলে তিনি জানান, তিনি খাব্বাদ হোসেন নন। তবে তিনি আহলে হাদিস আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তিনি জঙ্গিদের সঙ্গে সম্পৃক্ত আছে কি না এমন প্রশ্নের উত্তরে বলেন, আফজাল হোসেন নামে এক জেএমবি সদস্য আমার কাছে এসেছিল। আমি তাকে প্রত্যাখ্যান করি। সে আমার প্রাণনাশের চেষ্টা করে। আমি থানায় জিডি করি। এতেই তো প্রমাণ হয় আমার সঙ্গে জেএমবি বা জঙ্গিদের কোনো সম্পর্ক নেই। গোলাম আজম মনে করেন জঙ্গিদের সঙ্গে জামাতের যোগাযোগ থাকতেও পারে। তিনি আরো বলেন, জানি না আছে কি না। তবে জামায়াতের মধ্যে বেশ কিছু সদস্য আছে যারা অত্যন্ত কট্টর। তারা সম্পৃক্ত থাকলেও থাকতে পারে।

পুলিশের বক্তব্য

নাটোরের পুলিশ সুপার গোলাম কিবরিয়া সাপ্তাহিক ২০০০-কে জানান, 'উত্তরবঙ্গের মধ্যে নাটোরে সহিংস ঘটনা বেশি ঘটছে। তবে ক্রমানুসারে তা কমে আসছে। ২০০১ থেকে ২০০৩ সালের তুলনায় ২০০৪ ও ২০০৫ সালে তা অনেক কম।' জঙ্গি তৎপরতার ব্যাপারে গোলাম কিবরিয়া তার টেবিলে বেশ কিছু কাগজ দেখিয়ে বললেন, 'এগুলো সবই জঙ্গি তৎপরতা রিপোর্ট।' এই জেলাতেই প্রথম জঙ্গি ধরা পড়ার ঘটনা স্বীকার করে এসপি কিবরিয়া বলেন, 'প্রথম ওই জঙ্গিকে ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছিলো। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ না পাওয়ায় তাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।' বর্তমানে জঙ্গিদের তৎপরতার বিষয়ে তিনি বলেন, 'আমরা সক্রিয় আছি। কোথাও কোনো খবর পেলে আমরা তৎক্ষণাৎ খবর নিচ্ছি।' এ বছর ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে প্রথম আলোর বন্ধুসভাকে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান থেকে বের করে দেয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি সেখানে ছিলাম। বের করে দেয়ার বিষয়টি সত্য নয়। তবে গ্যাঞ্জাম একটু হয়েছিলো।'

সুকুল পট্টী আহলে হাদিস মসজিদের ইমাম ও মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল গোলাম আজম সম্পর্কে বলেন যে তার খোঁজ নিচ্ছি। নজর রাখছি তার অন্যান্য কর্মকান্ডেও।

নাটোর সদর থানার পুলিশ অফিসার খায়রুল জানান, জেলায় জঙ্গিদের তৎপরতা আছে। তবে পূর্বের তুলনায় কম। ১৭ আগস্ট রাতে শহর থেকে ৪ জঙ্গি ধরা পড়া সম্পর্কে তিনি জানান, জঙ্গিরা ১৭ আগস্ট ৭টি স্পটে বোমা ফাটিয়ে রাতে একত্র হয়েছিলো। আমরা গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গিয়েছিলাম। ৪ জনকে ধরি। বিপুলসংখ্যক পুলিশ থাকা সত্ত্বেও জঙ্গিরা পালিয়ে গেছে কীভাবে এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, জঙ্গিরা সশস্ত্র ছিলো। নলডাঙ্গা, সিংড়াসহ বেশ কয়েকটি স্থানে জঙ্গিদের অবস্থানের খবর তাদের কাছেও আছে বলে পুলিশের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান।

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তব্য

বিশিষ্ট লেখক জাকির তালুকদার জানান, নাটোরে একটা গাছের পাতা পড়লেও মন্ত্রী দুলুর অনুমতি নিতে হয়। শহরের নাট্যমঞ্চগুলি রাজাকাররাই দখল করে রেখেছে। জঙ্গিদের স্বর্গভূমি নাটোর। মাদকদ্রব্য, সন্ত্রাস নাটোরকে আক্ষরিক অর্থেই বিষিয়ে তুলেছে। শহরে বিশিষ্ট সংস্কৃত ব্যক্তিত্ব সুজা উল হামিদ জানান, নাটোরে মুক্ত সংস্কৃতি চর্চার পরিবেশ দিনকে দিন হারাচ্ছে। অপর মুক্তিযোদ্ধা অজিত দাশ বলেন, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একটা নাটক শেষমেশ মঞ্চস্থ করা যায়নি জামায়াত জোট বিএনপি সরকারের কারণে।

আজকে দেশের এ বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতির দায়ভার রাজনৈতিক দলের। বিশেষ করে ক্ষমতাসীন দলের। কারণ তারা একটি গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ দেশ গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনগণের কাছে ভোট চেয়েছিল। এ কারণে জনগণ তাদের ভোট দিয়েছিল। ক্ষমতাসীনদের আচরণে আজ ধূলিসাৎ হতে যাচ্ছে এ দেশের গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা। প্রশ্নের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে জঙ্গিদের গডফাদার কে বা কারা? মুফতি হান্নান, বাংলা ভাইরা কাদের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে চলে।